দ্বিতীয় প্রবাস - ৭

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

সাইদ রাকিম চলে গেলেও আমি ধীরে ধীরে ওদের শুরু করে দেয়া ছেলের বিয়ের প্রস্তুতির কাজ কর্মে লেগে গেলাম। কাজ কি আর কম? আমাদের ছেলে মেয়েরা আজকাল ট্রানসকন্টিনেন্টাল বিয়ে করবে কিন্তু তাদের বোন এবং মা খালাদের (এবং আশ্চর্য জনক ভাবে, তাদের নিজেদের ও) শখ সে বিয়ে বাংগালী কায়দায় হতে হবে! (এই কাঠালের আমসত্ত্ব জাতীয় ব্যাপারটা আমার কাছে মোটামুটি দূর্বোধ্য। অবশ্য এসব ব্যাপার 'বাবা' দের কাছে দুর্বোধ্য থাকলেও কিছু আসে যায় না, তারা 'ফাইনানসিয়ার' হতে অরাজী না হলেই হলো।) তবে দুই মহাদেশে বসবাসকারী দুই ভিন্ন সংস্কৃতির বর কনের এই বাংগালী কায়দার বিয়ের জোগাড় যন্ত্র করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। করণীয় কাজের তালিকা অবিশ্বাস্য রকমের দীর্ঘ; অনেক কিছুই করতে হবে। আপাততঃ আমেরিকা, কানাডা, ইংলন্ড এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বসবাসরত আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের ঠিকানা জোগার করে তাদেরকে বিয়ের কার্ড পাঠানো, কানেকটিকাটের মিডলটাউন শহরে যেখানে বিয়ে হবে তার কাছাকাছি জায়গায় দূর থেকে বিয়েতে যোগ দিতে আসা অতিথিদের জন্য মোটেলের জন্য ব্লক বুকিং দেয়া, ক্যাটারারদের সাথে যোগাযোগ করা এবং আনুষঙ্গিক এমনি আরো হাজারো কাজের মাঝে ডুবে গেলাম। তবে এসব কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে বেড়ানো আর বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার কাজ ও সমান তালে ই চলতে লাগলো।

এবারে আমেরিকা আসার প্রথম দিন থেকেই আমি এদেশে অভিবাসিত আমার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবন এবং কর্ম জীবনের পুরোনো বন্ধুদের খুঁজে বার করার চেষ্টা শুরু করি। যেহেতু এ যাত্রায় এদেশে প্রায় ছ'মাস সময় থাকবো, ঠিক করেছি সময় ও সুযোগ বুঝে এদের কারো কারো সাথে দেখা করবো। প্রথমেই আমার ইঞ্জিনিয়ারীং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধুআইনুল হককে ফোন করলাম। সোনিয়া-নোমান যখন প্রথম মিডল্যান্ড আসে তখন পাশের শহর মাউন্ট প্লিজেন্টের কোন এক পার্টিতে আইনুল হকের সাথে ওদের পরিচয় হয়েছিল। তারপর থেকে আইনুল এবং ওর গিন্নী খুকুভাবীর সাথে সোনিয়াদের মোটামুটি যোগাযোগ ছিল। আমরা দু'বন্ধুই ছিলাম মেটালার্জিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র এবং থাকতাম কায়েদে আজম হলের (এখনকার তীতুমির হলের) পাশাপাশি রুমে। আমাদের রাজনৈতিক দর্শন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। নারায়ণগঞ্জের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের এক সাহিত্যক মায়ের সাহিত্য ও সংস্কৃতি মনা সন্তান আমি ছিলাম ইঞ্জিনিয়ারীং বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়নের (মেননপন্থী) মোটামুটিভাবে প্রথম সারির 'প্রগতিশীল' ছাত্রনেতা, আর সাতক্ষীরার এক বিত্তশালী পরিবারের ক্রীড়ানুরাগী ছেলে আইনুল ছিল তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খানের সমর্থনপুষ্ট 'প্রতিক্রিয়াশীল' পেটোয়া ছাত্রদল এন এস এফের ইঞ্জিনিয়ারীং বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। অবশ্য ইঞ্জিনিয়ারীং বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটামুটিভাবে মেধাবী ছাত্রদের নেতৃত্বে গড়া এন এস এফ আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নামধারী

গুন্ডা 'খোকা - পার্সপারতু' দের নেতৃত্বাধীন এন এস এফের খুব একটা চরিত্রগত মিলর ছিল না। আমার যতদুর মনে পরে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের এন এস এফ মোটামুটি ভাবে তেমন কোন সহিংসতায় লিপ্ত হয়নি। সত্যি বলতে কি এন এস এফ এর মোটামুটি সব প্রথম সারির নেতারাই ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে বর্তমান ধর্মান্ধ বি এন পি - জোট সরকারের শিক্ষমন্ত্রী ওসমান ফারুকের বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ওসমান গণি এই পেটোয়া বাহিনীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল। দ্বিতীয় প্রবাসে বসে বাংলাদেশের ধর্মঘটি শিক্ষকদের প্রতি ওসমান ফারুকের নির্মম এবং অমানবিক ব্যবহারের যে চিত্র পত্র-পত্রিকার পাতায় পাওয়া যায়, তাতে আর কোন সন্দেহ থাকেনা যে ওসমান গণি বাবা হিসেবে সত্যিই সার্থক। গুনীজনরা যথার্থ ই বলেছেন 'বাপ কা বেটা, সিপাই কি ঘোড়া; কুচ নেহী তো থোড়া থোড়া !'

আইনুল হক ডেট্রয়েট শহরের কাছে ওলড ব্লুমসফিলড নামে এক ছোট শহরে তার স্ত্রী এবং দ্বিতীয় পুত্র রাজীব সহ এখন অবসর জীবন যাপন করছে। এই শহরটি মিডল্যান্ড থেকে প্রায় দু'ঘন্টার পথ। আগস্ট মাসের উনিশ তারিখে আমরা সপরিবারে ওখানে বেড়াতে গেলাম। পয়ত্রিশ বছর পর এক্কালের 'জানী দোস্ত' আইনুলের সাথে দেখা। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ছেড়ে আমেরিকায় চলে আসার আগের দিন ওর সাথে আমার শেষ দেখা। এরপর আমি সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক থাকাকালীন সম্ভবতঃ আশির দশকের শেষের দিকে আইনুল একবার আমাকে চাংগী এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করেছিল। সোনিয়াদের সাথে যোগাযোগ হবার পর অবশ্য আমেরিকা আসলে ওর সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ হতো, কিন্তু দেখা হয়নি। আইনুলের বাসায় আরো দেখা হলো আমার আরেক পুরোনো ইঞ্জিনিয়ার সহপাঠী আবদুর রাজ্জাকের সাথে। ওকে শেষ দেখেছিলাম চল্লিশ বছর আগে। আইনুলকে দেখে চিনতে কষ্ট হয়নি, মাথায় টাক পরলেও চেহারা এবং দাঁড়াবার ঋজু ভংগী এবং সাতক্ষীরার আঞ্চলিক বাচনভংগীতে ও আগের মতই বিশিষ্ট রয়ে গেছে। কিন্তু রাজ্জাককে দেখে আমি একেবারেই চিনতে পারিনি; ওর চেহারা, বাচনভংগী, জীবন দর্শ্ন সব সম্পূর্ণ বদলে গেছে। দুজনের নাম এক হলেও ছাত্রজীবনে আমি ও রাজ্জাক দুই ভিন্ন মেরুর মানুষ ছিলাম। তুখোর ছাত্র আবদুর রাজ্জাক ক্লাসের বাইরের সময়ের প্রায় পুরোটাই পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতো, আর আমার ব্যস্ততা ছিল নাটক, বিতর্ক, সাহিত্য-সংস্কৃতি সেবা আর রাজনীতি জাতীয় পড়াশোনার বাইরের যাবতীয় কাজ নিয়ে। রাজ্জাক জানালো আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছি শুনে ও প্রথম বিশ্বাস করতে পারেনি। ইঞ্জিনিয়ারীংয়ে আন্ডার-গ্রাজুয়েট করে (বলা যায় মোটামুটি ধাক্কা-টাক্কা খেয়ে) সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার বিষয় মার্কেটিংয়ে ডক্টরেট করে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সারির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছি এবং আমেরিকার নামকরা রাটগারস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে পড়াতে এসেছি - এ টা নাকি ছাত্রজীবনের আমার সাথে মেলানো কষ্টকর!

রাজ্জাক একটুও মিথ্যে বলেনি। সত্যি বলতে কি আমি যখন প্রথম শ্রেনীতে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে মেটাললার্জিকাল ইঞ্জিনিয়ারীং এর সমাপনী পরীক্ষা পাশ করলাম, তখন আমার শিক্ষক এবং বন্ধু-বান্ধবরাতো বটেই, আমি নিজেও খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য একটু আত্মশ্লাঘা যে হয়নি তা বলবো না, এত ধাক্কা-টাক্কা খেয়ে নিজের পছন্দ নয় এমন একটা বিষয়ে পড়াশুনা

করে প্রথম শ্রেনী পেয়ে যাব কখনো ভাবিনি। ম্যাট্রিক আর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় আমার খুব ভাল ফলাফল হলেও ইঞ্জিনিয়ারীং বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সেমেস্টারে আমি এক বিষয়ে ফেল করে সাপ্লিমেন্টারি দিয়ে পাশ করলাম । তৃতীয় সেমেষ্টার, অর্থাৎ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারীং এর প্রথম সেমেষ্টারে ও একই অবস্থা; তবে এবার সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দিয়েও আর পাশ করা হলো না; পরীক্ষার হলে অসুস্থ হয়ে তিন মাস টাইফয়েডে শয্যাশায়ী থাকলাম। বাধ্য হয়ে এক বছর পিছিয়ে গেলাম। আর সেই সাথে পরিচিতজনদের কাছ 'আমি ভাল ছাত্র'র তকমাটা হারিয়ে গেল। এর চেয়েও বড় কথা আমি নিজেই 'আমি ভাল ছাত্র' এই বিশ্বাসটা হারিয়ে ফেললাম।

আমি কখনোই ইঞ্জিনিয়ারীং পড়তে চাইনি, আমার ইচ্ছা ছিল অর্থনীতি কিংবা কলা অনুষদের অন্য কোন বিভাগে পড়াশুনা করে পি এফ এস (পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস) কিংবা সি এস পি (সিভিল সার্ভিস অফ পাকিস্তান) হবো। আমার ধারণা ছিল (সম্ভবতঃ সে বয়সে সবারই থাকে) যে আমি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে (বাবা-চাচারা খুব ভালভাবেই মাথায় সে বিশ্বাস ঢুকিয়েছিলেন), বেশ সুদর্শন (!), মেধাবী ছাত্র (!), 'আউট' বই পড়ে অনেক সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী (!) এবং এইসব সুপেরিয়র সার্ভিসের জন্য আদর্শ ক্যান্ডিডেট। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার আইন ব্যবসায়ী বাবার মত ছিল ভিন্ন। আইনজ্ঞ হওয়ার সুবাদে সি এস পি করা এস ডি ও বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছেন এবং এদের 'উন্নাসিক' ব্যবহার তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তাই এদের ব্যপারে বরাবরই বাবার একটা অনীহা ছিল। এ ছাড়া তাঁর এক জার্মান ইঞ্জিনিয়ার মক্কেলের কাছ থেকে তিনি আমাকে ইঞ্জিনিয়ারীং পড়ানোর ব্যাপারে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। তাই নিজের অনিচ্ছাতেও বাধ্য হয়েই আমাকে ইঞ্জিনিয়ারীংয়ে ভর্তি হতে হয়। এই রসকসহীন (আমার মতে) বিষয়ের পড়াশোনায় আমি কখনো মন বসাতে পারিনি; আমার পছন্দের বিষয়, যেমন নাটক, বিতর্কসভা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি।

ইঞ্জিনিয়ারীং পড়তে গিয়ে একটা বছর নষ্ট হয়ে গেল, এই ব্যাপারটায় বাবা এত কষ্ট পেলেন যে আমার সংগে কথা বলাই এক রকম বন্ধ করে দিলেন। মা ও খুব কষ্ট পেলেন, প্রায়ই তিনি কাঁদতেন। বাসায় থাকা মুশকিল ছিল, তাই এক সেমেষ্টারের জন্য নারায়ণগঞ্জের বার একাডেমী স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিলাম। শিক্ষা বছরের শুরুতে আবার ক্লাসে ফিরে এলাম; তবে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারীং পড়তে নয়, এবার ভর্তি হলাম মেটালার্জিকাল ইঞ্জিনিয়ারীং। ঠিক করলাম যেমন করেই হোক পাশ করতেই হবে। মেটালার্জিকাল ইঞ্জিনিয়ারীং এর মোট এগারজন ছাত্রের ক্লাশে একমাত্র সাহাবুদ্দিন ছাড়া বাকী দশজনই এক বছর নষ্ট করার দলে। অথচ এদের প্রত্যেকেরই ম্যাট্রিক এবং ইন্টারমিডিয়েটে প্রথম বিভাগ ছিল! একদিন দুপুরে বিভাগীয় প্রধান ডঃ ইব্রাহীম আমাকে তার রুমে ডাকালেন, এবং বলা যায় ছাত্র হিসেবে আমার প্রচন্ড অধঃপতনের কারণ জানতে চাইলেন। আমি যথারীতি 'আমি পড়তে চাইনি, বাবা জবরদস্তী করে ইঞ্জিনিয়ার বানাতে চাইছেন' জাতীয় ইতিহাস শোনাতেই তিনি বললেন আমার উচিত ইঞ্জিনিয়ারীং পড়া বাদ দিয়ে অন্য কিছু করা। আর তা যদি না করতে চাই তবে পড়াশোনায় মন সংযোগ করা। ডঃ ইব্রাহীম আমার আবাসিক হল কায়েদে আজম হলের প্রভোস্ট ছিলেন। আমার চারিত্রিক কিছু বৈশিষ্টের কথা (সেগুলো কি এখন আর মনে করতে পারছি না) উল্লেখ করে তিনি আরো বললেন যে আমি এখনো চেষ্টা করলে

প্রথম শ্রেনী পেতে পারি। সে সময় মেটালার্জিকাল ইঞ্জিনিয়ারীং এ এরিক বাকনাল নামক একজন অশীতিপর বৃদ্ধ বৃটিশ ভিজিটিং অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ও কোন এক বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে আমাকে একই ধরণের কথা শোনালেন। বাবা-মায়ের মর্ম-বেদনা, দুঃখ, স্যারদের উৎসাহ এবং আমার জীবন থেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া একজন বিশেষ মানুষের উৎসাহে আমি আবার ভাল ছাত্র হওয়ার চেষ্টায় লেগে গেলাম। এবং কি আশ্চর্য, কোন বিষয়েই ফেল না করে, প্রথম শ্রেণীর গড় মার্কসের চেয়ে সামান্য হলেও বেশী নম্বর নিয়ে থার্ড ইয়ারে উঠলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় এক সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন, এবং আমদের সারা পরিবার এক চরম আর্থিক বিপর্যয়ের সন্মুখীন হলাম। তবে এই বিপর্যয়ে মুষড়ে না গিয়ে কি করে যেন এক ইস্পাত কঠিন প্রত্যয়ে নিজের ভাল ফলাফল করার চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করলাম। সেটা খুব সহজ ছিল না। আর্থিক অভাবের কারণে তিনজন ছাত্র-ছাত্রীকে পড়িয়েছি; রাত জেগে পার্ট-টাইম কাজ করেছি, নাটক কিংবা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চালিয়ে কমিয়ে দিলেও একেবারে ছাড়িনি এমন কিা ইলেকশনও করেছি। তবে ঘুমহীন রাতের নিভৃতে পুরোদমে পড়াশোনাও চালিয়ে গিয়েছি। এই দুঃসময়ে আমার একটা সম্যক উপলব্ধি হয়েছে; আল্লাহ তার সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে অমিত শক্তির আধার করে বানিয়েছেন। সত্যিকারভাবে চাইলে এবং চেষ্টা করলে মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে।

প্রথম শ্রেনীতে পাশ করার পর আবার মনে হোল আসলেই বোধ হয় আমি একজন 'মেধাবী' ছাত্র। তারপর তো জীবনই বদলে গেল। চট্টগ্রাম স্টীল মিলসে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দু'মাস চাকুরী করার পর ফোর্ড ফাউন্ডেশনের বৃত্তি নিয়ে আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। সেখানকার ব্লুমিংটন ক্যাম্পাসের গ্রাজুয়েট স্কুল অব বিজনেসে এম বি এ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই বি এতে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলাম। তারপর সুদান, সিংগাপুর, অষ্ট্রেলিয়া হয়ে আজ দ্বিতীয় প্রবাসে আবার আমেরিকায়। এই দেখুন, কোথা থেকে কোথায় চলে এলাম; ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে শুরু করেছি। আসলে আবদুর রাজ্জাককে দেখার পর হঠাৎ করেই এতসব কথা মনে হোল।

চলবে - -

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)